তাফসীরুল কোরআন : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি

শাহ্ আব্দুল হান্নান*[১]

মাওলানা মোহাম্মদ আরকম খাঁ সাবেক বঙ্গে বিগত পাঁচশত বছরে যেসব মহান (Great) ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের একজন। সম্ভবত চার-পাঁচজনের মধ্যে একজন হবেন। তিনি রাজনীতিতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন ছিলেন এবং সংবাদপত্র জগতের পুরোধা ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন লেখক। ইতিহাস, সাহিত্য, নবি জীবন এবং কুরআনের গবেষক ও সাহিত্যিক।

নবি জীবনের ওপর রচিত তার 'মোস্তফা চরিত' যারাই পড়েছেন তারাই জানেন, তিনি কত বড় গবেষক ছিলেন। তিনি রসুল সা.-এর জীবনী সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাতে কল্পকাহিনী ত্যাগ করেছেন, কেবল প্রামাণ্য বিষয়গুলো গ্রহণ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিভিন্ন কুটিল এবং অপ্রামাণ্য সমালোচনার যুক্তি সঙ্গত উত্তর দিয়েছেন। তাতে তিনি এ সংক্রান্ত কিছু হাদিসও পরীক্ষা করেছেন এবং এসব হাদিসের মতন (Text) পরীক্ষা করে, উসূলবিদদের মতন (Text) পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতেই 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলেছেন। তার সাথে সবাই একমত হবেন- এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তার গবেষণা আমাদের পথ দেখাবে, বিচার-বিবেচনা বৃদ্ধি করবে। তার 'মোছলমে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' একটি অসামান্য কীর্তি। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক বিশ্লেষণমূলক বই খুব কমই আছে।

মাওলানা আকরম খাঁর অসামান্য শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তার কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির 'তাফসীরুল কোরআন'। এ তাফসির তিনি সাধু ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য, মিষ্ট, যেন নদীর মতো প্রবহমান। অনেক অনুবাদের চেয়ে তার অনুবাদ ভালো। আমার কাছে তার অনুবাদ বাংলায় শ্রেষ্ঠ অনুবাদ মনে হয়েছে। অনুবাদে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। শব্দ ব্যবহারে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১. 'তাকওয়া' শব্দের তিনি কয়েকটি অর্থ করেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সংযম। যেমন তিনি সুরা বাকারায় 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন'-এর অনুবাদ করেছেন 'নিশ্চয় তোমরা সংযমশীল হইতে পারিবে।'
২. 'ফাসেক' শব্দের তিনি অনুবাদ করেছেন, 'দুষ্কর্মপরায়ণ'। এটি আমার বিবেচনায় খুবই সুন্দর অনুবাদ হয়েছেন (দ্রষ্টব্য: সুরা বাকারা, ২: ২২, তাফসীরুল কোরআন, ঝিনুক প্রকাশনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৮)।
৩. তিনি সুরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াতের 'আসমায়া' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'বস্তু তত্ত্বগুলো', যা এর অসাধারণ অনুবাদ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪)।

তিনি যথাসম্ভব তার অনুবাদে নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং যেখানে নারীর অগ্রগণ্যতা আছে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি সুরা আলে ইমরানের ৩৬ নম্বর আয়াতের 'লাইসায যাকারু কাল উনসা' বাক্যাংশের অনুবাদ করেছেন 'অথচ পুরুষ তো নারীর সমতুল্য নহে' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫)।

যারা সবসময় সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতের কথা বলেন, তাদের এ আয়াতের কথাও মনে রাখা উচিত। তার তাফসিরে বিভিন্ন ঘটনার অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি নবিদের মুজিজায় বিশ্বাস করতেন; কিন্তু অপ্রামাণ্য যুক্তিহীন কথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি মূসা আ:-এর বনি ইসরাইলসহ মিসর থেকে পলায়নের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। তার মূল কথা হলো, তারা লোহিত সাগর দিয়ে পার হননি, নীল নদ দিয়ে পার হয়েছেন। আগের

1

তাফসিরগুলোতে প্রধানত বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ও কিংবদন্তিগুলোকে ভিত্তি করা হয়েছে। এটা কুরআনের কোনো অক-াট্য আয়াত বা প্রামাণ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো: "আলোচ্য আয়াতে (সুরা বাকারার ৫০ নম্বর আয়াত) প্রথম অংশে 'ফারাকনা' ও 'আলবাহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাহর শব্দের অর্থ সম্পর্কে অভিধানকাররা বলেছেন, ০১. অধিক পরিমাণে সঞ্চিত পানি, কেবল লোনা পানি (কামুছ)। ০২. প্রত্যেক নহরই বাহর (জাওহারি)। ০৩. বাহর 'স্থল'-এর বিপরীত শব্দ; লোনা পানি, প্রত্যেক বড় নহর, যেকোনো প্রশস্ত বস্তু (মাওয়ারেদ)।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নীল নদের তীরবর্তী কোনো এক অঞ্চলে ইসরাইলিদের বসবাস ছিল। (সেখান থেকে) তারা যাইতেছিল পূর্ব পুরুষের দেশে। ...ফিলিস্তিন ও জেরুসালেমই ছিল তাদের গম্যস্থান। মিসরীয় সীমা অতিক্রম করার পরই তাহারা উপস্থিত হইয়াছিল ছীনা উপদ্বীপে এবং তীহ প্রান্তরে। কুরআন মজিদে এর যথেষ্ট প্রমাণ মওজুদ আছে (সুরা ত্বহা ৮০ আয়াত প্রভৃতি)।"

তারপর আকরম খাঁর বক্তব্য হচ্ছে, মিসর থেকে ৫০০ মাইল, গভীর সমুদ্র পথ পার হয়ে আরবে উপনীত হয়ে সেখান থেকে ফিলিস্তিন যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কেননা, তাদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের যানবাহনও ছিল না। হেঁটে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। তার পরিবর্তে মিসর থেকে একটি হ্রদ বা তার বেলাভূমি পার হয়ে সিনাই পৌঁছা অনেক সহজ ছিল। তিনি বলেছেন, ফেরাউন যে স্থানে ডুবে মরেছিল, তার জন্য বাহর ও ইয়াম দু'টি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দু'টির অর্থই নদী বা যেকোনো জলাশয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ফেরাউন যে লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল, এটা ইহুদি বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের বর্ণনা মাত্র। কুরআন বা হাদিসে এ দাবির কোনো সমর্থন নেই।

এরপর তিনি উপসংহার টেনেছেন এভাবে, "সুয়েজখাল কাটার পূর্বে ভূ-মধ্যসাগর হতে সুয়েজ শহর পর্যন্ত দীর্ঘ এই ভূ-ভাগটা ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন হ্রদ, বিল, হাওর নানা শ্রেণির জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল এবং বহুস্থানে এখনও আছে। মরা কোটালের সময় এই অঞ্চলের পানি স্বাভাবিক নিয়মে অনেক কম হইয়া যাইত। এ সময়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু চরগুলো ভাসিয়া উঠিত। তাহার পার্শ্ববর্তী অগভীর জলাভূমিগুলো শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার ভরা কোটালের সময় জোয়ারের পানি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া ওই স্থানগুলোকে ডুবাইয়া ফেলিত। ... হজরত মূসা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই ঠিক সময় অর্থাৎ উপযুক্ত তিথিতে মিসর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তিনি পথের নির্দেশও লাভ করিয়াছিলেন আল্লাহর হুজুর হইতে। তাই বনী ইসরাইল রক্ষা পাইয়াছিল এবং সেই জন্যই ফেরাউন ডুবিয়া মরিয়াছিল। আমার মতে, হজরত মূসার নবীজীবনের প্রধানতম মো'জযা ইহাই" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮৭)'।

তিনি তার তাফসিরে কুরআনে কোনো মানসুখ আয়াত না থাকার অভিমত সমর্থন করেছেন। তিনি সুরা বাকারার ১৮৪ ও ১৮৫ নম্বর আয়াতের তাফসিরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই আয়াতে 'ইউতীকূনাহূ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।"

তিনি 'ইউতীকূনাহূ' শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি- 'যাহারা রোজা রাখিতে সমর্থ হয় বিশেষ ক্লেশের সহিত' বলিয়া। আমার মতে ইহাই সঙ্গত অনুবাদ। ইমাম রাযী র.-ও এই অভিমতের সমর্থন করিতেছেন (তফসিরে কাবীর, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইমাম রাগিবও তাহার অভিধানে আলোচ্য শব্দের এই অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাফসিরের রাবীগণের অধিকাংশ ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'যাহারা রোজা রাখিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রোজা না রাখে, তাহারা রোজার বদলে ফিদিয়া (মিসকিনের খানা) প্রদান করিবে।"

এ অসঙ্গত অনুবাদের ফলে, এ জমানার একদল প্রগতিশীল পণ্ডিত ব্যবস্থা দিতেছেন যে, কোনো ওজর-আপত্তি না থাকলেও ফিদিয়া দিয়া রোজা ভাঙ্গা যেতে পারে। অন্যদিকে, একদল রাবী ও তাফসিরকার বলছেন, ১৮৪ আয়াত নাজিল

হওয়ার সাথে সাথে ১৮৫ আয়াত দ্বারা মানছুখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহর কালাম। একটি আয়াত নাজিল করার পর মুহূর্তে তাকে মানছুখ করে দেয়ার খামখেয়ালি তাতে সম্ভবপর হতে পারে না। বস্তুত কুরআন মাজিদের মানছুখ আয়াত একটিও নেই (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫)।

সুরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত টীকা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "এই প্রসঙ্গে আরো বলা হইতেছে যে, স্ত্রীর যেরূপ দাবি ও অধিকার রহিয়াছে স্বামীর উপর, স্বামীরও সেরূপ দাবি ও অধিকার রহিয়াছে স্ত্রীর উপর। উভয়ে নিজ নিজ কর্তব্য অবহিত হইয়া চলিলে, সংসারেই স্বর্গ সুখ-শান্তি নামিয়া আসে। নারীর তুলনায় পুরুষের দরজা এক ডিগ্রি বেশি অর্থাৎ পুরুষের কর্তব্য নারীর তুলনায় অধিক। সুরা নিসার ৩৪ আয়াতে পুরুষকে নারীর 'কাউয়াম' বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বলা হইয়াছে। মেসেল শব্দের অর্থ "Similar, Equal" (প্রাগুক্ত, সুরা বাকারার টীকা ১৮১, পৃ. ২৭৫)।

তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্বকালের দাসীদেরকে বিবাহ ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। তিনি লিখেছেন, "একশ্রেণীর আলেম মনে করেন যে, দাসী-বাঁদীদের বিবাহ করার নির্দেশ এ আয়াতে দেয়া হয় নাই। তাহারা মনে করেন যে, দাসী-বাঁদীদিগকে মালিকানা স্বত্বাধিকারের বলে যথেচ্ছভাবে সম্ভাব করা যাইতে পারে, সে জন্য বিবাহের দরকার হয় না। আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিমত ইসলামের সাধারণ আদর্শ ও কোরআন প্রবর্তিত বিশেষ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে" (প্রাগুক্ত, সুরা নিসা, টীকা নম্বর ৭, পৃ. ৫৮০)। এরপর তিনি তার অভিমত সম্পর্কে সব যুক্তি পৃ. ৫৮১-৮২ তে তুলে ধরেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এ তাফসিরগ্রন্থ এক অসাধারণ আধুনিক তাফসির। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আসাদের তাফসিরের সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে। তাকে তাফসিরের ক্ষেত্রে 'এ উপমহাদেশের আসাদ' গণ্য করা যায়।

তার যুক্তিবাদী তাফসির অনেকের কাছে অপছন্দ হতে পারে; কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে, তিনি তার তাফসিরে যুক্তি ছাড়া কোনো মত দেননি। এ তাফসিরের পুনর্মুদ্রণ ও ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন।